জ্ঞান ও পবিত্রতায় ভাস্বর এক মহীয়সী

আয়িশা (রা.)

ড. ইয়াসির ক্বাদি

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন স

সূচিপত্র

আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর পরিচয়	৯
নবিজির সঙ্গে বিয়ে	১৪
অন্য উম্মুল মুমিনিনদের তুলনায় অগ্রগামী	২২
সম্মান ও মর্যাদা	২৬
নবিজির সাথে মধুর সম্পর্ক	৩০
মানবীয় ঈর্ষা এবং আমাদের শিক্ষা	৪১
নিয়ামতপ্রাপ্ত নারী	৫৮
তাকওয়া ও ঈমান	৬৪
হুমায়রা	৬৮
জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা	৭১
সাহাবিদের ভুল সংশোধন	৭৮
আরবের ডাক্তার	৮৫
উষ্ট্রের যুদ্ধ	৮৭
বিয়ের বয়স : দুষ্টের সমালোচনা এবং হিস্টোরিক্যাল রিভিশন	৯৩
আয়িশা (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের পরিণাম	১০৮

আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর পরিচয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)। আয়িশা (রা.)-এর ষষ্ঠ পুরুষ মুররা ইবনে কাবের সূত্রে নবিজির বংশধারার সাথে তাঁর বংশধারা মিলে যায়। ঠিক এভাবে—

আয়িশা বিনতে আবু বকর ইবনে উসমান ইবনে আম ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তামিম ইবনে মুররা ইবনে কাব।[১]

তাঁর মায়ের প্রকৃত নাম জানা যায় না। তবে জানা যায়, তাঁর মায়ের উপনাম ছিল উম্মে রুমান। অবশ্য অনেকে বলেছেন—তাঁর মায়ের নাম ছিল জয়নব। আবার কেউ কেউ বলেছেন—তাঁর মায়ের নাম ছিল দাদ। তিনি কুরাইশ বংশীয় ছিলেন না; ছিলেন কিনানা গোত্রভুক্ত।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দুই অথবা তিনজন স্ত্রী ছিলেন। তার মধ্যে উম্মে রুমান (রা.) ছিলেন দ্বিতীয়। আবু বকর (রা.)-এর অপর স্ত্রী উম্মে আসমা ইসলাম গ্রহণ করতে না পারলেও উম্মে রুমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আয়িশা (রা.)-এর দেওয়া তথ্যানুযায়ী—তাঁর পিতা-মাতা তাঁর জন্মের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) বলেন—

> ‘আমার জানামতে, তাঁরা ইতোমধ্যেই (আমার জন্মের পূর্বেই) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।’[২]

সুতরাং আয়িশা (রা.)-এর বাবা-মা তখন পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে আয়িশা (রা.) মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি আরও বলেন—

> ‘মক্কায় এমন কোনো দিন যায়নি, যেদিন নবিজি আমাদের বাড়ি ঘুরে যেতেন না।’[৩]

বুখারিতে উল্লেখ আছে, আয়িশা (রা.) বলেন—

> ‘যতদূর মনে পড়ে, একদিন আমার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর বাড়ির সামনে মসজিদ নির্মাণ করবেন (সম্ভবত তখন আয়িশা রা.)-এর বয়স ছিল তিন-চার বছর। এখানে মসজিদ বলতে কোনো কিছু বিছিয়ে নামাজ আদায়ের স্থান বানানোর কথা বলা হয়েছে; কোনো স্থাপত্য নয়)। বাড়ির সামনের রাস্তার পাশের সে জায়গায় তিনি নামাজ পড়লেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলেন। কুরাইশ নারী ও শিশুরা জড়ো হয়ে তাঁর নামাজ

---

[১] إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع বৈরুত, ১ম সংস্করণ, খণ্ড-৬, পৃ.-৩৫

[২] বুখারি : ১/১৮১

[৩] বুখারি : ২১৩৮

> দেখতে থাকল। কুরআন শরিফ পড়ার অমায়িক সুর এবং আবু বকর (রা)-এর আবেগাপ্লুত কান্না দেখে তাঁরা আরও উৎসুক হয়ে উঠল। এর কিছুদিন পর তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তা সম্ভব হয়নি।'[৪]

যেহেতু এ ঘটনা আয়িশা (রা.)-এর বয়স তিন-চার বছর সময়ে ঘটে, তাই এ ঘটনা ততটা স্পষ্টভাবে তাঁর মনে ছিল না।

আয়িশা (রা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন মুসলিম হিসেবে। কারণ, আয়িশা (রা.)-এর মা উম্মে রুমান (রা.) তাঁর জন্মের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন জাগে, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল?

বর্তমান সময়ে তাঁর বয়স নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। মূলত এটা কোনো বিষয়ই না। অযথা কুতর্ক। কারণ, পূর্ববর্তী জামানায় বয়স নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। তবে অনুমান করা যায়, বিয়ের সময় তিনি অল্পবয়সি তরুণী ছিলেন।

বুখারি ও মুসলিমে তাঁর বরাতে বর্ণিত হয়েছে—

> 'যখন নবিজির সাথে আমার বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। আর নয় বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর আমরা একান্তে রাত্রিযাপন করি।'[৫]

আমরা অন্য যে সকল বক্তব্য শুনি, তা সবই এই বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। তাহলে লোকেরা কেন অবিশ্বাস করে? আমরা সবাই জানি, তিনি মুসলিম হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—এটাই বিতর্কের মূল কারণ! এ ছাড়া তো বিতর্ক থাকার কথা ছিল না। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এক বা দুই শতক পেছনে ফিরে তাকালে দেখি যে, বিবাহে বয়সের এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবধান নিয়ে কথাবার্তা বলা রাজনৈতিকভাবে কতটা স্পর্শকাতর।

একটি দল অবমাননাকর 'শব্দ' ব্যবহার করে কেবল নবিজি ও তাঁর স্ত্রীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য। শ্রদ্ধাবশত আমরা সেসব শব্দ উল্লেখ করলাম না। কেবল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লোকরাই পারে এমন কুৎসা রটাতে এবং নেতিবাচক শব্দ প্রয়োগ করতে। বয়সের ব্যবধানের প্রশ্ন সামনে এনে তাঁরা এমনসব কথা বলার দুঃসাহস দেখায়, যা কখনো কাম্য নয়। তাদের ভাষ্য—এতে নাকি সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল!

আবার অনেকে বলতে চেষ্টা করেন—আয়িশা (রা.)-এর বয়স বিয়ের সময় আরও বেশি ছিল। ঠাট্টা করে বলতে হয়—তারা কি এমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.) ছিলেন ১৮-১৯ বছরের তরুণী? কাকতালীয়ভাবে এ যুগে এমনটা অনেকেই বলার চেষ্টা করেন। আমি এ মতের বিরুদ্ধে। তবে আমি যেকোনো সংশোধনবাদের (রিভিশনিজম) পক্ষে।

---

[৪] বুখারি : ৪৫৬, খণ্ড-২, পৃ.-২৮৪

[৫] বুখারি : ৩৮৯৪; মুসলিম : ১৪২২

রিভিশনিজম সর্বদা মন্দ নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। যদি অতীতে ফিরে যাওয়ার বাস্তব ও যথার্থ কারণ থাকে এবং কারও বক্তব্য পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার মতে, শুধু রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনা অযৌক্তিক।

সুশীল সমাজ ন্যায়-অন্যায় যা-ই বলুক না কেন, তা কখনোই সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি হতে পারে না। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করতে হয়। আর ঠিক এ কারণে 'প্রোগ্রেসিভ ইসলাম' শব্দটা একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। কোথা থেকে এসব শব্দ আবিষ্কার হয়, তা আল্লাহই ভালো জানেন! মূলত তাদের ইলম ও ইসলাম চর্চার কোনো শিরদাঁড়া নেই। তাদের মনঃপূত বিষয়গুলোকে তারা রাজনৈতিকভাবে শুদ্ধ এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে (কিন্তু অন্যগুলোর ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব উলটো)। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব?

তবে এটাও মনে রাখতে হবে, অতীতের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে আমাদের গোঁড়ামি দেখানোর প্রয়োজন নেই। এটা অনুচিত। কারণ, সেই কল্পিত অতীত অনেক সময় সত্য নাও হতে পারে। তাই ভারসাম্যের প্রয়োজনে আমাদের কখনো কখনো পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আমরা ভুল কোনো কিছু অন্ধের মতো লালন করার মতো জাতি নই। তবে আয়িশা (রা)-এর বিয়ের বয়সসংক্রান্ত সহিহ বর্ণনার বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। আয়িশা (রা.)-এর জীবনী বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল ফোকাস বজায় রাখার জন্য আমরা একটি উসুল মেনে চলব।

নবিজির সঙ্গে বিয়ে

মা আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের ব্যাপারে আমরা কমবেশি জানি। তিনি নিজে বর্ণনা করেন—

> ‘নবিজি আমাকে বলেন, বিয়ের পূর্বে আমি তোমাকে স্বপ্নে দুইবার দেখেছি। কেউ তোমাকে সিল্কের কাপড়ে ঢেকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। আর সে আমাকে বলছিল—“এ তোমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী।” আমি কাপড় উত্তোলন করলাম, আর তোমাকে দেখলাম। তারপর স্থির করলাম, এ সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তবে আমি তা বাস্তবায়ন করব।’[৬]

খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। জিবরাইল (আ.) আয়িশা (রা.)-কে সিল্কের কাপড়ে করে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। আবরণ অবমুক্ত করলে তিনি মা আয়িশা (রা.)-কে দেখতে পান। স্বপ্ন দেখে নবিজি নিজে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেননি। বলেছিলেন—‘এ সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তবে আমি তা বাস্তবায়ন করব।’

অর্থাৎ নবিজি ধারণা করেছিলেন, এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তবে তিনি এতে আবু বকর (রা.)-এর দ্বারস্থ হননি (হতে পারে তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন তাই)। পরবর্তী সময়ে আল্লাহর ইচ্ছায় খাওলা বিনতে হাকিম (রা.)-এর মধ্যস্থতায় তাঁদের বিয়ে হয়।

খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) নবিজির নিকট গিয়ে বলেন—

‘হে রাসূলুল্লাহ! আপনাকে দেখে বিষণ্ন ও নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। আপনি কি অন্য কাউকে বিয়ে করতে চান?’

‘তুমি কার কথা বলছ?’

‘যদি তালাকপ্রাপ্তা কোনো নারী হয়, তবে সাওদা (রা.)। আর যদি অবিবাহিত কোনো নারী কামনা করেন, তবে আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)।’

নবিজি বললেন—‘যাও, উভয়ের সাথেই কথা বলো।’

---

[৬] বুখারি : ৩৬০৬

> অর্থাৎ তিনি উভয়ের ব্যাপারে সম্মত ছিলেন। অতঃপর খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) যান আয়িশা (রা.)-এর মাতা উম্মে রুমান (রা.)-এর কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে বলেন—
>
> ‘সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নবিজি আয়িশাকে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।’[৭]

এ কথা শুনে উম্মে রুমান (রা.) উৎফুল্লতা প্রকাশ করেন। এরপর তাঁরা উভয়ে আবু বকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে আনন্দ সহকারে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) বলেন—‘তিনি কি আমার ভাই নন?’

আবু বকর (রা.)-এর এমনটা বলার কারণ হলো, নবিজি তাঁকে ‘ইয়া আখি’ বা ভাইজান বলে সম্বোধন করতেন। ফলে তিনি সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। এরপর খাওলা (রা.) নবিজির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলেন।

তখন রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘সে আমার মুসলিম ভাই, আমিও তাঁর মুসলিম ভাই। কিন্তু তাঁর কন্যা আমার জন্য হালাল। কেননা, সে আমার রক্তের সম্পর্কীয় ভাই নয়।’[৮]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবু বকর (রা.)-এর এটি না জানাই স্বাভাবিক। নবিজি তাঁকে সম্বোধন করতেন—‘হে আমার ভাই!’ আর এটা ছিল তাঁর মর্যাদার স্মারক।

অতঃপর খাওলা (রা.)-এর মাধ্যমে দেওয়া নবিজির প্রস্তাবে আবু বকর (রা.) অনেকটা রাজি হয়ে যান। তখন উম্মে রুমান (রা.) বলে ওঠেন—

> ‘তুমি কি মুতইম ইবনে আদির সাথে প্রতিশ্রুত হওনি যে, তার পুত্র জোবায়েরের নিকট তোমার কন্যা বিয়ে দেবে?’

আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে শিশু বয়সে ঠিক হয়ে গিয়েছিল মুতইম ইবনে আদির ছেলে জোবায়েরের সাথে (যেমনটি নবিজির কন্যার সাথে আবু লাহাবের ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল)। আর আবু বকর (রা.) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মতো ব্যক্তি নন।

এক্ষেত্রে আবু বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-কে জোবায়েরের নিকট বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এর মানে এই নয় যে, বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। যাহোক, এ বিষয়ে সমাধানের জন্য তিনি মুতইম ইবনে আদির বাড়িতে যান। তৎক্ষণাৎ মুতইমের স্ত্রী তাঁকে বলে বসেন—

> ‘তুমি আমাদের তোমার ধর্মে রূপান্তর করতে চাও? তোমার কন্যাকে আমাদের কাছে এজন্য বিয়ে দিতে চাচ্ছ—যাতে সে আমাদের ধর্মান্তরিত করতে পারে?’[৯]

---

[৭] المستدرك على الصحيحين, কিতাবুন নিকাহ, খণ্ড-২, পৃ.-৫১৮

[৮] বুখারি : ৫০৮১

সম্মান ও মর্যাদা

আমরা এখন আলোচনা করব আয়িশা (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে। এ জন্য নিচে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি। এর মাধ্যমে জানতে পারব, আমাদের আম্মাজান আয়িশা (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা কতটুকু।

ক. সকল পুরুষ ও মহিলা সাহাবির মধ্যে মা আয়িশা (রা.) ছিলেন দ্বিতীয় সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। আবু হুরায়রা (রা.) সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। হাদিসের এমন কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না, যেখানে আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদিস নেই। তিনি ২২০০-এর অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ১৭৪টি হাদিস 'মুত্তাফাকুন আলাইহি'।

খ. বিখ্যাত সাহাবি আবু মুসা আল আশআরি (রা.) বলেন—

> 'যখনই কোনো সাহাবির হাদিসের মর্মার্থ বুঝতে সমস্যা দেখা দিত, আমরা মা আয়িশার কাছে চলে যেতাম। তখন তিনি তা খোলাসা করে দিতেন।'[১০]

ইবনে শিহাব জুহরি (রহ.) বলেন—

'মা আয়িশার জ্ঞান যদি এক পাল্লায় রাখা হতো, আর অন্য সকল স্ত্রীর জ্ঞান আরেক পাল্লায় রাখা হতো, তাহলে মা আয়িশার পাল্লাই ভারী হতো।'[১১]

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন—

> 'মা আয়িশা (রা.) এ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ নারী। তিনি ফতোয়া দিতেন, ফিকাহ শেখাতেন। নবিজির অন্য কোনো স্ত্রী সে অবস্থানে পৌঁছাতে পারেননি।'[১২]

গ. তাঁর সমগ্র জীবদ্দশায় তিনি নবিজির মনন ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন। ফিকাহের কিতাবগুলোর পবিত্রতা অধ্যায়ে অধিকাংশ সময় এ বিখ্যাত হাদিসটি বর্ণনা করা হয়—

> 'একজন আনসারি মহিলা নবিজির নিকট এলেন। তখন আয়িশা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা বেশ কয়েকটি বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন।

[৯] طبقات ابن سعد (৯ : ৮)

[১০] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৬১৪৫

[১১] قال ابن شهاب الزهري: لو جمع علم الناس كلهم وعلم أمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علم

[১২] ফাতহুল বারি : ৭/১০৭

> প্রশ্নগুলো ছিল এমন—
>
> “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন, ঋতুর সময়ের পর কোন পদ্ধতিতে গোসল করতে হয়?”
>
> “হায়েজের পর গোসল করবে। এ সময় এক টুকরা কাপড় বা তুলা নিয়ে তাতে সুগন্ধি মাখবে, অতঃপর তা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে।”
>
> “কী পরিষ্কার করব?”
>
> (নবিজি লজ্জায় মাথা নিচু করে বললেন) “সুবহানাল্লাহ! পরিষ্কার করে ফেলবে।”[১৩]
>
> এ পর্যায়ে আয়িশা (রা.) বুঝতে পারলেন, নবিজি লজ্জা পাচ্ছেন। ফলে তিনি আনসারি মহিলাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—“সে জায়গার রক্তের চিহ্ন মুছে পরিষ্কার করে ফেলবে।”’

ঘ. আয়িশা (রা.) তাঁর কতক ছাত্রী ও আপনজনকে বললেন—‘আমি ১০টি রহমতের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত।’ তাঁরা সেসব জিজ্ঞাসা করলে তিনি একে একে বললেন—

১. ‘আমিই একমাত্র কুমারী নারী, যাকে নবিজি নিকাহ করেছেন।’

২. ‘আমি ব্যতীত নবিজির অন্য কোনো স্ত্রী তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে মুহাজির হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি।’

৩. ‘আল্লাহ তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে আমার নিষ্কলুষতার ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেছেন।’

এটা অনেক বড়ো ফজিলত যে, মা আয়িশা (রা.)-এর নিষ্কলুষতা ও মর্যাদা বর্ণনাকারী আয়াত মানুষ আজ অবধি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে। কুরআনের এক সূরার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর শুদ্ধতা, নিষ্কলুষতা ও মর্তবা নিয়ে আলোচনা এসেছে। অন্য কোনো স্ত্রী এমনকি খাদিজা (রা.)-কে নিয়েও এমন আয়াত নাজিল হয়নি। অবশ্যই খাদিজা (রা.)-এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আয়িশা (রা.)-এর মধ্যে ছিল না। আবার আয়িশা (রা.)-ও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা খাদিজা (রা.)-এর মধ্যে ছিল না।

৪. ‘নবিজি স্বপ্নে দেখতে পান, জিবরাইল (আ.) আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে আসেন।’

৫. ‘একই পাত্র থেকে আমি ও নবিজি গোসল করেছি, যে সৌভাগ্য অন্য কোনো স্ত্রীর হয়নি।’ বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত, নবিজির ওফাতের পর আয়িশা (রা.)-কে বেশ কয়েকজন নারী জিজ্ঞাসা করেছিল—‘আমরা কি স্বামীদের সাথে জানাবাতের গোসল করতে পারব?’

---

[১৩] ফাতহুল বারি : ১/৪৯৪

নবিজির সাথে মধুর সম্পর্ক

নবিজি ও আয়িশা (রা.)-এর পারস্পরিক ভালোবাসা ছিল বেশ আলোচিত। তাঁদের ভালোবাসা এতটাই আলোচিত ছিল যে, অন্য সাহাবিরা এমনকি অন্য স্ত্রীরাও নবিজির নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এই ভালোবাসাকে ব্যবহার করতেন।

পূর্বের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি, যখন কেউ রাসূল ﷺ-কে কিছু উপহার দিতে চাইত, তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করত—আয়িশা (রা.)-এর দিন কবে? এর ওপর নির্ভর করেই তাঁরা পরবর্তী সময়ে রাসূল ﷺ-কে উপহার প্রদান করত। আর যুক্তিসংগতভাবেই এটা ছিল অন্য স্ত্রীদের নিকট কিছুটা বিরক্তির কারণ। এটা এমন একটি বিষয়, যা রাসূল ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

এ ছাড়া বুখারিতে একটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে, যেখানে আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

> ‘আমি আমার মাসিকের সময় একটি কাপ থেকে পানি পান করতাম।[১৪] আমি কাপটি থেকে পানি পান করার পর তা রাসূল ﷺ-কেও পান করতে দিতাম। তিনি কাপটি ঘুরিয়ে নিতেন, যাতে তাঁর ঠোঁট ঠিক সেই স্থানে স্পর্শ করে, যেখানে আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। আমি মুরগির হাড্ডি থেকে গোশত খেয়ে তা রাসূল ﷺ-কে দিতাম, তিনি সেটা ঘুরিয়ে নিতেন, যাতে তাঁর ঠোঁট ঠিক একই স্থান স্পর্শ করে, যেখানে আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল।’[১৫]

এ দুটো ঘটনায় আমরা লক্ষ করলাম, প্রথমে খাওয়া শুরু করেছিলেন আয়িশা (রা.)। এর দ্বারা রাসূল ﷺ-এর অমায়িক স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েননি; বরং স্ত্রীকে প্রথমে খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর আমাদের কিছু সংস্কৃতি রয়েছে—(যা সঠিক বা বেঠিকের বিষয় নয়) স্ত্রীরা ততক্ষণ পর্যন্ত খায় না, যতক্ষণ না ঘরের পুরুষ খাবার গ্রহণ শেষ করে। অথচ এখানে রাসূল ﷺ-এর পরিবারে আমরা দেখি—আয়িশা (রা.) প্রথমে খাবার গ্রহণ করেছিলেন, পানাহার করেছিলেন, তারপর রাসূল ﷺ-কে দিয়েছিলেন।

---

[১৪] এখানে মাসিকের কথা উল্লেখ করার মূল কারণ হলো, একটি ফিকহি বিষয় তুলে ধরা। অর্থাৎ একজন নারীর মাসিক তাকে অপবিত্র করে না। এটাতে কোনো সমস্যা নেই।

[১৫] মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ : ৪৮৭

আর তিনি মাসিকের কথা এ কারণেই উল্লেখ করেছিলেন যে, মদিনার প্রাক-ইসলামিক যুগের সংস্কৃতিতে ইহুদিদের আইনানুসারে বলা হতো—মাসিকের সময় নারীরা অপবিত্র হয়ে যায়। এর কিছু প্রভাব আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। মাসিকের সময়ে নারীরা অপবিত্র হয়ে যায়—এই চিন্তার দ্বারা বিষয়টি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, সে যদি কিছু স্পর্শ করে, তাহলে তা থেকে কেউ খেতে বা পান করতে পারবে না। একই টেবিলে বসতে পারবে না, একই থালায় খাবার খেতে পারবে না। পুরো সপ্তাহের জন্য তাকে অন্য কোথাও বসতে হবে, পৃথক অবস্থায় খাবার খেতে হবে এবং পৃথক হয়ে ঘুমাতে হবে। পুরো সপ্তাহজুড়ে তাঁর একটি আলাদা বিছানা থাকবে অথবা স্বামী-স্ত্রীর আলাদা বিছানা থাকবে।

আর এই বিষয়টি আনসাররা ইহুদিদের থেকে গ্রহণ করেছিল। এ কারণে আয়িশা (রা.) বলেছিলেন—'মাসিকের সময়ে আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম।' আয়িশা (রা.)-এর মাসিকের কথা উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো—শরিয়াহর বিষয়টি তুলে ধরা। অর্থাৎ একজন নারী তাঁর মাসিকের সময়ে স্বামীর সেবা করতে পারবে, রান্না করতে পারবে, স্বামীর সাথে খেতে পারবে, পানাহার করতে পারবে, স্বামীর সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতে পারবে। তবে নিষিদ্ধ হলো শারীরিক সম্পর্ক। এই একটি বিষয় ছাড়া খাওয়া, পানাহার করা, চুল আঁচড়ানো ইত্যাদি সবকিছুই হালাল।

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমার মাসিকের সময় রাসূল ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতাম; তখন তিনি আমার কোলে শুয়ে থাকতেন।'[১৬]

এমনকি রাসূল ﷺ-এর চুল কিংবা মাথার নিকটবর্তিতাও কোনো সমস্যা তৈরি করত না। কেননা, আয়িশা (রা.) তখন অপবিত্র ছিলেন না। তখন ছিল না কেবল একটি কর্মের অনুমতি। এ ছাড়া বাকি সবকিছুরই অনুমতি ছিল।

আয়িশা (রা.) নিজে বলেছেন—

> 'একদিন রাসূল ﷺ খুব ভালো মেজাজে ছিলেন। তাই আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম—"হে রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য একটু দুআ করুন।" রাসূল ﷺ বললেন—"হে আল্লাহ! তুমি আয়িশাকে মাফ করে দাও। তাঁর সকল গুনাহ, যেগুলো সে করেছে এবং করছে, সব মাফ করে দাও। আর মাফ করে দাও সে সকল গুনাহ, যেগুলো সে গোপন রেখেছে এবং যেগুলো সে প্রকাশ্যে করেছে।"'

এতে আয়িশা (রা.) খুব খুশি হলেন এবং জোরে হাসতে লাগলেন। আর হাসতে হাসতে তিনি বিছানায় বসে পড়লেন। তাঁর হাসি খুব দৃশ্যমান ছিল বিধায় রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—

'আমার এই দুআ কি তোমাকে এতই খুশি করেছে?'

---

[১৬] বুখারি : ২৯৭

উষ্ট্রের যুদ্ধ

উসমান (রা.)-এর শাসনকাল। তখন চারদিকে ফিতনার ছড়াছড়ি। এই সময় উসমান (রা.)-এর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)। তিনি উসমান (রা.)-এর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার সময় আয়িশা (রা.) হজ পালন করছিলেন। ফলে তিনি সেখানে আসতে পারেননি। পরে উসমান (রা.)-এর হত্যার খবর শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং মদিনায় ফিরে না গিয়ে ইরাকে চলে যান। হত্যাকারীদের শিরশ্ছেদের ঘোষণা তিনিই প্রথম দেন। এ ঘটনার সূত্র ধরে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে আয়িশা (রা.) উষ্ট্রের পিঠে চড়ে যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্ব দেন। বর্ণনানুযায়ী—এ যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন, তবে সেটা কারও আঘাতে নয়। তাঁকে আঘাত করার মতো দুঃসাহস কারও নেই। তাঁর উট আহত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত কিছু তির তাঁর দিকে এসেছিল। সেই তিরের আঘাতে আয়িশা (রা.)-এর হাত রক্তাক্ত হয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সবাই আয়িশা (রা.)-এর খোঁজ করছিলেন। কারণ, এ যুদ্ধে তিনি পরাজিত এবং অনেক মানুষ নিহত হয়েছিল। আলি (রা.) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.)-কে পাঠালেন আয়িশা (রা.)-কে খোঁজার জন্য। তিনি তাঁকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন। নবিজির পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী আলি (রা.) তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করলেন এবং সম্মানজনকভাবে তাঁকে বসরায় পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় ৪০ জন নারীকে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রাখা হয়। আলি (রা.) তাঁর দুই সন্তান হাসান ও হুসাইন (রা.)-কেও তাঁর দেখভাল করার জন্য সাথে প্রেরণ করেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, অনাকাঙ্ক্ষিত এ যুদ্ধের পর তাঁদের মধ্যকার আচরণ অসুন্দর ও অনৈসলামিক ছিল না।

সহিহ বর্ণনানুযায়ী—

> ‘আয়িশা (রা.) এ ঘটনার জন্য সারাজীবন পরিতাপ করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। বলতেন—“হায়! আমি যদি বৃক্ষ বা পাথর হয়ে জন্মগ্রহণ করতাম, তাহলে এ ঘটনায় থাকতাম না!” তিনি যখন “ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না” আয়াতাংশ পড়তেন, তখন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতেন— “হায়! আমি যদি ঘরে অবস্থান করতাম!”’[১৭]

---

[১৭] বুখারি : ৪৪৭৬; মুসনাদে আহমাদ : ১/২২০

আয়িশা (রা.) কখনোই যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ চাননি। তিনি কেবল প্রতিবাদ করেছিলেন; কিন্তু কখনো কখনো প্রতিবাদও সহিংস হয়ে ওঠে। আর সে যুগে সবার কাছেই অস্ত্র থাকত। ফলে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য না থাকলেও এটা ঘটে যেত। আয়িশা (রা.) কখনোই চাননি এ রক্তপাত বা যুদ্ধ হোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। আয়িশা (রা.) মনে করতেন, এতে তাঁর অংশগ্রহণ করা উচিত হয়নি।

তখন আলি (রা.) ও আয়িশা (রা.) দুজনই নিজেদের সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে পারেননি। কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করেন, সেখানে তেমন কিছু হয়নি। এটি অতিরঞ্জিত কথা। আর অতিরঞ্জন কখনো ভালো কিছু বয়ে আনে না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সেখানে দুটি বাহিনী একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, রক্তপাত হয়েছে।

তবে আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সতর্ক থাকব, যেন আমাদের কোনো বক্তব্য অতিরঞ্জিত না হয়ে যায়। এ ঘটনার ব্যাপারে আলি (রা.) উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) সম্পর্কে কোনো বাজে মন্তব্য করেননি। আর আয়িশা (রা.)-ও কখনো আলি (রা.) সম্পর্কে বাজে কিছু বলেননি। তাঁরা একে অপরের প্রতি ইসলামি ও সম্মানজনক আচরণ করেছেন এবং ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করেছেন।

আলি (রা.)-এর মৃত্যুর পর আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) ক্ষমতায় আসেন। তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের সময় আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা সেসবের বিবরণে যাব না। কেননা, এ বইটির আলোচ্য বিষয় সেগুলো নয়। শুধু মাথায় রাখবেন, আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট। কারণ, তিনি ছিলেন নবিজির একজন সাহাবি। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব, কিন্তু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সাহাবির সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে যাব না। তিনি নবিজিকে দেখেছেন কিশোর বয়সে। ছিলেন কনিষ্ঠ সাহাবি। জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের সাথে তাঁর কোনো তুলনা হয় না। আমরা কেবল তাঁদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করব। কারণ, আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন—‘রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট।’

মুয়াবিয়া (রা.) সব সময়ই আয়িশা (রা.)-এর সমর্থন লাভের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। আয়িশা (রা.)-এর কাছে অনেক উপহার পাঠিয়েছেন। একবার তাঁর কাছে এক লাখ দিরহাম উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আয়িশা (রা.) একটি দিরহামও স্পর্শ করেননি; বরং এক ঘণ্টার মধ্যে তা অন্যদের দান করে দিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে অনেক উপহার দিতেন। এমনকি তিনি আয়িশা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে একবার মদিনায়ও এসেছিলেন। আয়িশা (রা.) তাঁকে বাড়ির ভেতরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন (অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে)। তবে তাঁদের আলাপচারিতা ঝামেলাবিহীন ছিল না বলেই অনুমান করা হয়। কেননা, মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা আয়িশা (রা.) পছন্দ করেননি। যার অন্যতম হলো—মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.) আলি (রা.) দ্বারা মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) ক্ষমতায় আসার পর মিশরের গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.) তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্য মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠান। সেখানে তাঁকে

পরাজিত ও বন্দি করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও প্রদান করা হয়। এজন্য মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতি আয়িশা (রা.) অসন্তুষ্ট ছিলেন। শুধু এ ঘটনাই নয়; তখন এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল।

ফলে সাক্ষাতের সময় আয়িশা (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) পরস্পরের মর্যাদা সমুন্নত রাখলেও আয়িশা (রা.) তাঁর প্রতি খুশি ছিলেন না।

তিরমিজি শরিফের একটি বিখ্যাত হাদিসে এসেছে—

> 'মুয়াবিয়া (রা.) সংক্ষিপ্ত উপদেশ চেয়ে আয়িশা (রা.)-এর নিকট পত্র পাঠালেন। আয়িশা (রা.) তাঁকে লিখলেন—
> "আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি—যারা আল্লাহকে খুশি রাখতে গিয়ে জনগণকে অখুশি রাখে, আল্লাহ জনগণ থেকে (জনগণের ক্ষতি থেকে) তাকে হেফাজত করেন। আর যে জনগণকে খুশি রাখতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে জনগণের নিকট ছেড়ে দেন (জনগণের দ্বারা তার ক্ষতি হয়)।"'[১৮]

এখানে একটি রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে। এটা মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর বড়ো ধরনের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। আয়িশা (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-কে নসিহত প্রদান করেছেন, যা তিনি চিঠি মারফত চেয়েছিলেন।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়কার একটি বিখ্যাত ঘটনা সহিহ বুখারিতে এসেছে। মদিনায় মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিয়োগকৃত গভর্নর ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। এ সময় মুয়াবিয়া (রা.) মারওয়ানের কাছে বার্তা পাঠালেন—

> 'আমি ইয়াজিদকে আমার পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। আমার মৃত্যুর পরে ইয়াজিদ হবে খলিফা। সুতরাং আমার জীবিতাবস্থায়ই সকল গভর্নরকে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে।'

এটা ছিল এক নতুন ধারণার প্রবর্তন, যা ইসলামের ইতিহাসের মোড়কে চিরতরে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। খিলাফতে রাশেদা রূপান্তরিত হয়েছিল খিলাফতে মুলুকিয়াতে। এখানে মনে রাখতে হবে, এ খিলাফতে মুলুকিয়া হারাম কিছু নয়। কতিপয় ধারার আলিমগণ মনে করেন যে, এটা হারাম। না, এটা হারাম নয়। তবে এটা পুরোপুরি ইসলামের মূল আদর্শ অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাও নয়। কিন্তু এটাকে হারাম বলার সময় মাথায় রাখতে হবে—যদি খিলাফতে মুলুকিয়া হারাম হয়, তবে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এ বিশাল অধ্যায়কে হারাম সাব্যস্ত করা হবে।

---

[১৮] মাজমুউল ফাতওয়া : ২/২৩২-২৩৩

বিয়ের বয়স
দুষ্টের সমালোচনা এবং হিস্টোরিক্যাল রিভিশন

এ বিষয়টি নিয়ে পূর্বে খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে, তবে এখানে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল—এ নিয়ে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। আর এ সমস্ত হাদিসের সনদ সহিহ, যা বিভিন্ন সনদে বুখারি-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তখন তাঁর বয়স কত ছিল, তা খুবই সুস্পষ্ট; এটা নিয়ে মতভেদ থাকাটাই বেমানান।

আয়িশা (রা.)-এর নিজ ভাতিজা হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) তাঁর পিতা উরওয়া (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন; আর তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন স্বয়ং আয়িশা (রা.) থেকে। এ ছাড়া অন্যরাও আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন; আয়িশা (রা) বলেন—

> 'নবিজি যখন আমাকে বিয়ে করেন, তখন আমি ছিলাম ছয় বছর বয়সি। আর নয় বছর বয়স হওয়ার পর তিনি আমার সাথে রাতযাপন শুরু করেন। আর যখন তিনি ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।'[১৯]

এ হাদিসটি বহুসংখ্যক তাবেয়ি বর্ণনা করেছেন, যারা আয়িশা (রা.)-এর নিকট থেকে এ বক্তব্য সরাসরি শুনেছেন। সুতরাং বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। এ ছাড়া অন্য সাহাবিগণও এটিই বর্ণনা করেছেন।
তিরমিজি শরিফে উল্লিখিত হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'নবিজির সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। তাঁরা একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন নয় বছর বয়সে। আর আয়িশা (রা.)-এর ১৮ বছর বয়সে নবিজি ইন্তেকাল করেন।'[২০]

এ হাদিসেও আমরা ঠিক একই রকম বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি। জাবির (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'নবিজির সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। তাঁরা একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন তাঁর নয় বছর বয়সে। আর নবিজি তাঁর (আয়িশা রা.-এর) ১৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।'

---

[১৯] বুখারি : ৩৮৯৪; মুসলিম : ১৪২২

[২০] মুসলিম : ১৪২২

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, একই বর্ণনা এসেছে। ছয় আর সাত খুব বেশি পার্থক্যের ব্যাপার নয়।

অর্থাৎ এসব বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারছি, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ছয়-সাত বছর। আর নয় বছর বয়সের সময় নবিজির সাথে তাঁর একান্তে রাত কাটানো শুরু হয় এবং তাঁর ১৮ বছর বয়সে নবিজি ইন্তেকাল করেন। এ ছাড়া সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে অনিশ্চিত কোনো বক্তব্যের অস্তিত্ব নেই।

আরেকটি বিষয় হলো—তাঁর বয়সের ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। যদিও ঐতিহাসিক বয়সসংক্রান্ত ব্যাপারে ইজমা হয় না, তারপরও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন গ্রন্থকার আয়িশা (রা.)-এর বয়সের ব্যাপারে ইজমা প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনে আবদুল বার (রহ.)। তিনি বলেন—

> ‘আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে কোনো মতপার্থক্যের কথা আমার জানা নেই।’

ইবনে কাসির (রহ.) বলেন—

> ‘এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, নবিজির সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। তাঁরা একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন তাঁর নয় বছর বয়সে।’

ইবনে হাজেমসহ অনেক উলামা আয়িশা (রা.)-এর বয়স সম্পর্কে একই মত পোষণ করেন।

এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ইজমা ও ধর্মতত্ত্বের ইজমা এক নয়। আর ইতিহাস ও আকিদা এক জিনিস নয়। সুতরাং কেউ যদি এ ইজমার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে এবং বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ১৮ বছর ছিল বলে দাবি করে, তবে আমরা বলব না এটা বিদআত, ভুল চিন্তা কিংবা সুন্নি আকিদার বিপরীত। কেননা, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব এক বিষয় নয়। যদিও কেউ কেউ মনে করেন, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব একই বিষয়।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো—কেউ যদি নিজেদের মতামতকে কোনোভাবে প্রমাণ করতে চায়, এতে আমাদের তেমন কোনো সমস্যা নেই।

তবে আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে হিস্টোরিক্যাল রিভিশন করার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আজকাল অধিকাংশ দেশে এত কম বয়সে বিয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়সসংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য পরিবর্তন করতে চাওয়ার পেছনে বর্তমান তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং রাষ্ট্রের আপত্তি উত্থাপনের বিষয়টি জড়িত। এ আপত্তির কারণে আয়িশা (রা.)-এর বয়স পরিবর্তন করতে হিস্টোরিক্যাল রিভিশন করা হয়। কিন্তু এতে একটি বিপজ্জনক দরজা খুলে যায়। আর তা হলো—পরবর্তী সময়ে তথাকথিত সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে অগ্রহণযোগ্য বিভিন্ন ইসলামিক ইস্যু নিয়ে হিস্টোরিক্যাল রিভিশন করার প্রবণতা শুরু হবে—যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।